2-5-47
10
এস্, আর্, রেয়াদের
নিবেদন
রায় চৌধুরী
রচনা ও পরিচালনা
শৈলজানন্দ

নিউ সেঞ্চুরীর সত্বাধিকারী
এস. আর হেমাদের
নিবেদন

রায়-চৌধুরী

রচনা ও পরিচালনা
শৈলজানন্দ

সঙ্গীত রচনা
মোহিনী চৌধুরী

সুর-শিল্পী
শৈলেশ দত্ত গুপ্ত

ব্যবস্থাপক
লাল মোহন রায়

সহকারী
তারক পাল

সহকারী
শৈলেশ রায়

চিত্র-শিল্পী
সুধীর বোস, অজয় কর

শিল্প-নির্দ্দেশক
বটু সেন
তারাপ্রসাদ বিশ্বাস

সহকারী
বিশু চক্রবর্ত্তী, সমীর
বিমল মুখোপাধ্যায়

সহকারী
পরিচালনায়ঃ
৺ ন্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কমল চট্টোপাধ্যায়
ফণীন্দ্র পাল
মুরলীধর বসু
প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ-যন্ত্রী
জে, ডি, ইরানী

সহকারী
পাঁচু গোপাল দাস
সিদ্ধি নাগ

ভূমিকায়ঃ দেবী মুখার্জ্জী, অহীন্দ্র, কমল, মনোরঞ্জন, নরেশ, পাঁচকড়ি, বেচু, কানু, নবদ্বীপ, রঞ্জিত, আশু, কমল চ্যাটার্জ্জী, প্রমীলা, পূর্ণিমা, প্রভা, সুপ্রভা, বীণা, ছবি, কেতকী, শম্ভু, ন্যাংটেশ্বর, অমর চৌধুরী, প্রবোধ হাসি, স্নেহ, মেনকা, মীনা, শেফালী, প্যাঁচাবাবু, হাজুবাবু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি।

পরিবেশকঃ

রায়-চৌধুরী

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, কথা-শিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রায়-চৌধুরী' নামে একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসটির গল্পাংশ অবলম্বন করেই এই 'রায়-চৌধুরী' ছবির নাট্য-চিত্র রচিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে এমন অনেক ঘটনা এবং চরিত্র আছে, যা এই চিত্র-নাট্যে নেই, আবার এই চিত্র-নাট্যে এমন অনেক কিছু আছে, যা 'রায়-চৌধুরী উপন্যাসে নেই। কাজেই উপন্যাস ও ছবি— এই দুটিকে কেউ যেন এক করে' দেখবেন না। এই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

আমাদের এই বাংলা দেশের পশ্চিম সীমান্তে—ঢেউ-খেলানো মাটি যেখানে গেরুয়া রঙে রাঙ্গা' সেই রাঙা-মাটির নীচে ছিল কালো কয়লা। এই কয়লার কল্যাণে—সেখানকার মাটির যাঁরা মালিক,— তাঁদের অনেকেই হ'লেন জমিদার। এমনি দুই জমিদার বংশ—রায় আর চৌধুরী, একই গ্রামে অনেক দিন থেকে প্রজা পালনের নামে প্রজা শাসন করে' আসছিলেন।

একই গ্রামে দুই জমিদার—এক খাপে দুই তলোয়ারের মত। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘষাঘষি হয়, আগুনের ফুল্‌কি ছোটে! কেউ কাউকে সহ্য করে না। একের প্রতিপত্তি, অপরের হয়ে উঠে চক্ষুশূল। আমাদের গল্পের যবনিকা যখন উঠলো— অনেক বিবাদ, অনেক বিসম্বাদের পর—উভয় পক্ষই তখন ক্লান্ত।

একদিকে প্রতাপ রায়ের প্রতাপ গেছে কমে, একমাত্র পুত্র অশ্বিনীর হাতে সংসারের দায়িত্ব ভার সমর্পণ করে' একটুখানি বিশ্রাম গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করছেন, আর একদিকে চৌধুরী-বংশের ভবানী চৌধুরী একটুখানি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; তাঁরও একমাত্র ছেলে —বিজয়, বয়স মাত্র তের কি চোদ্দ।

সেদিন বিজয়া-দশমী। দূরে প্রতিমা বিসর্জনের বাজনা বাজছে। চৌধুরীর ছেলে বিজয় আর অশ্বিনী রায়ের মেয়ে বিমলা— ছোট্ট একটি পাখী নিয়ে করলে ঝগড়া। বিমলা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেল। বিমলার বাবা অশ্বিনীরায় শুনলে – ভবানী চৌধুরীর ছেলে বিজয় তাকে মেরেছে।

অশ্বিনী রায় কি করবে তাই ভাবছিল, এমন সময় কার্ত্তিক খবর নিয়ে এ—

চৌধুরীদের দুর্গা-প্রতিমা রায়েদের প্রতিমার চেয়ে প্রায় আধহাত-খানেক বড় করে' তৈরি করানো হয়েছে।

রায়দের সঙ্গে টেক্কা দেবার মতলব!

অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করলে কার্ত্তিককে: চৌধুরীদের প্রতিমা যাবে কোন্ রাস্তা দিয়ে?

কার্ত্তিক বললে: 'যেদিক দিয়ে প্রতি বছর যায়; আপনাদেরই সদর দিয়ে।'

অশ্বিনী রায় তক্ষুনি তাদের বাড়ীর সুমুখে রাস্তার উপর শালের খুঁটি আর দেবদারু পাতা দিয়ে একটা তোরণের মত 'গেট্' তৈরি করে' ফেললে।

চৌধুরীদের প্রতিমার চালি গেল সেই 'গেটের' গায়ে আট্‌কে। গেট্ না কাট্‌লে পেরুবার উপায় নেই।

চৌধুরীর নায়েব বনমালী হুকুম 'কাটো গেট্'।

কিন্তু এই গেট্ কাট্‌তে গিয়েই বাধলো গোলমাল। দেখা গেল, বন্দুক হাতে নিয়ে অশ্বিনী দাঁড়িয়ে আছে। গেট্ সে কিছুতেই কাটতে দেবে না।

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন: গেট্ না কাটলে প্রতিমা পেরুবে কেমন করে?

অশ্বিনী বললে: 'হামাগুড়ি দিয়ে পেরুবে। রায়েদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে চৌধুরীরা পেরুবে বুকে হেঁটে'।

এই নিয়ে সুরু হ'লো ভীষণ ঝগড়া!

রায়েদের এক দারোয়ান কিষণ সিং চৌধুরীর ছেলে বিজয়কে আড়কোলা করে' তুলে নিয়ে গিয়ে নহবৎখানার ওপর থেকে আছড়ে ফেলে দিতে চাইলে, চৌধুরী তখন তাদেরই একটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে, দিলেন চালিয়ে। বিজয় বাঁচলো, কিন্তু কিষণ সিং গেল মরে'।

বাধলো মামলা

কিন্তু হঠাৎ একদিন আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে খুনের আসামী ভবানী চৌধুরী ফিরে এলেন গ্রামে !

কিষণ সিংকে তিনি ইচ্ছে করে মারেননি। তাঁর একমাত্র পুত্র বিজয়কে বাঁচাতে গিয়েই বন্দুক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তবু নাজানি কেন, দিবারাত্রি তাঁর মনে হ'তে লাগলো—নরহত্যা মহাপাপ' এবং এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতেই হবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে ভেতরে ভেতরে তিনি জীর্ণ হ'তে লাগলেন, এবং অবশেষে একদিন সত্য সত্যই অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আমি আর বোধ হয় বাঁচবো না। ভবিষ্যতে কোনদিন যদি সুযোগ পাও, রায়েদের সাথে, আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলো। নইলে একদিন দেখবে—আমাদের এই গ্রামে রায় আর চৌধুরী বংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না।

শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কথাই সত্য হ'লো।

নাবালক পুত্রটিকে রেখে ভবানী চৌধুরী মারা গেলেন।

পনেরো বছর পরে দেখা গেল, ভবানী চৌধুরীর শ্যালক—পাচুণ্ডী গ্রামের কালোবরণ ঘোষ (কালু মামা) ভাগিনেয় বিজয়ের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে এসে তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে' দিয়ে বাড়ী চলে গেছে। স্বর্গীয় ভবানী চৌধুরীর বিগত ঐশ্বর্য্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে সেই ছোট বিজয় বড় হয়েছে। মা তার গয়না বেচে ছেলেকে পড়িয়েছে। বিজয় ডাক্তারী পাশ করেছে। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, যুবক,—মনে-মনে সঙ্কল্প করেচে গ্রাম ছেড়ে

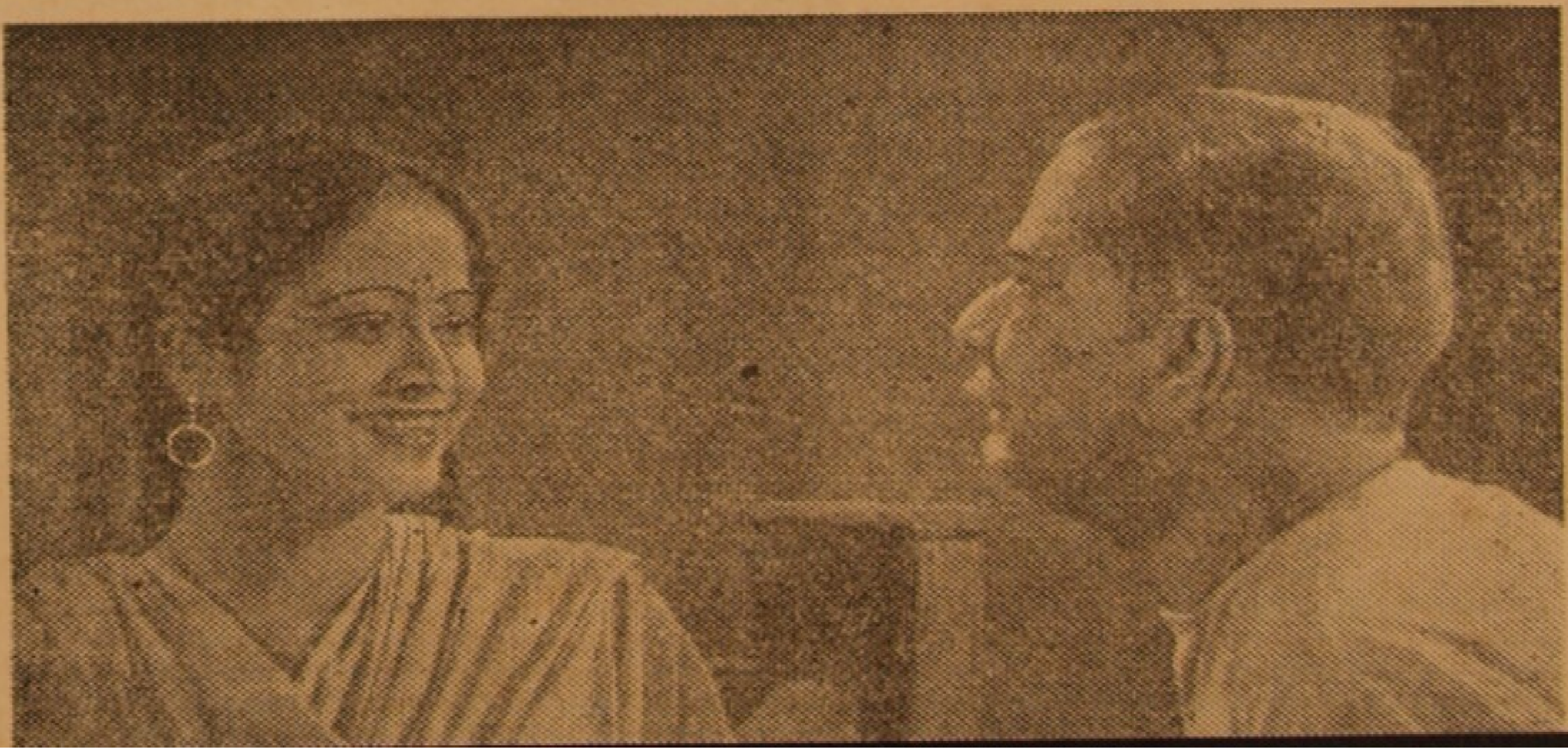

সে কোথাও যাবে না, মানুষকে রোগের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেবে। রক্তে তার নবজীবনের উদ্দীপণা, চোখে তার নবযুগের স্বপ্ন!

রায়েদের কয়লা-কুঠি তখন খুব জোর চলেছে।

একদিন সেই কলিয়ারির একজন সাঁওতাল কুলি এসে বিজয়কে ডেকে নিয়ে গেল তার ছেলের চিকিৎসা করাতে।

কলিয়ারীর একজন মাইনে-করা ডাক্তার আছে, তা জেনেও বিজয় সেখানে কেন গেল—এই নিয়ে অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে হ'লো তার একটুখানি কথা কাটাকাটি এবং এর পরিণামে যা ঘটলো, সে এক ভারি মজার ঘটনা।

বিজয়কে ধরে' এনে নীচের একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে' দিয়ে অশ্বিনী গেল পুলিশ ডাকতে।

বিজয়ের বাল্যকালের খেলার সাথী অশ্বিনীর মেয়ে বিমলা তখন বেশ বড় হয়েছে। ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগলো না।

দোরটা এই সময় খুলে দিলে কেমন হয়?

বিমলা খানিক্‌টা এগিয়ে গেল, কিন্তু না, লজ্জা করে।

বুড়ো ঠাকুরদা বসে বসে বই পড়ছিলেন। বিমলা তাঁরই শরণাপন্ন হ'লো। বৃদ্ধ প্রতাপ রায় দেখলেন, বিজয়ের উপর বিমলার পক্ষপাতিত্ব যেন অতিরিক্ত রকমের বেশী। এ যেন বন্দীর প্রতি শুধু অনুকম্পা নয়, এ যেন 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!'

প্রতাপ রায়ও মনে-মনে যেন এমনি একটা সুযোগই খুঁজছিলেন। তিনি

ভবানী চৌধুরীও মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিজয়ের মাকে এই কথাই বলে গিয়েছিলেন।

বলে গিয়েছিলেন : 'সুযোগ-সুবিধা পেলেই ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে নিও।'

কিন্তু মিটলো কি ?

রায় আর চৌধুরী বংশের পুরুষানুক্রমে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলে আসছিল এই বৈবাহিক সম্বন্ধেই কি তার পরিসমাপ্তি ঘটলো ?

বোধহয়—না।

তারপর মিলন একদিন হ'লো সত্য, কিন্তু কেমন করে' হ'লো, সহসা কোন্ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বিধাতার অভিশাপ নেমে এলো আশীর্ব্বাদের মত, ঐশ্বর্য্যের দম্ভ কেমন করে' ধূলায় লুটিয়ে পড়লো—সে দৃশ্য নিজের চোখে দেখাই ভালো।

---

(১)

ঝুমুর গান

সকলেঃ ফুলঝুরি পাহাড়ে সাঁঝের বেলায়
পাহাড়িয়া সুরে কে বাঁশী বাজায়

প্রথম রমণীঃ আসি ঝরণা তীরে বাঁশী বাজায় ধীরে
আকুল নয়নে পথ পানে চায়—

দ্বিতীয়ঃ তোর পানে নয় ও সে মোর পানে চায়

সকলেঃ যখন বাঁশী বাজায়।

প্রথমঃ পথ চলি লয়ে কলসী কাঁখে
শুধু দেখব তাকে ঐ পথের বাঁকে

তৃতীয়ঃ তোর আশা মিছে তুই যা'সনা পিছে
ওসে উত্তরে চলিতে দক্ষিণে যায়।

সকলেঃ পাহাড়িয়া সুরে কে বাঁশী বাজায়—।

কথা— ঝুমুর-বিশারদ : নিত্যানন্দ দাস।

(২)

বিমলার গান

আজ এলে বুঝি এলে ফিরে।
সেই হারানো পাখী এই নতুন নীড়ে।
বনে তাই ফুল ফুটেছে
মনে মনে গান জেগেছে
ঝিকি মিকি আলো নাচে তোমায় ঘিরে,
সেই হারানো পাখী সেই নতুন নীড়ে।

(৩)

শতদলের গান

এ মালা খুলবো না গো খুলবো না।
এ স্বপন ভুলবো না গো ভুলবো না।
পাখীর মতন মেলবো পাখা আকাশে
মনের কথা বলবে। তোমায় আভাসে
সুখের দুখের দোলায় শুধু দুলবো মোরা দু'জনা
একটি ছোট ফুলের মালায় বাঁধবো দুটী হিয়া গো
দুখের দিনে বন্ধু হবো, সুখের রাতে প্রিয়া গো—
ঘুম ভাঙ্গাবো, মান ভাঙ্গাবো
হাসির আলোয় মন রাঙ্গাবো
চোখের জলে হৃদয় খানি
ব্যথায় ভরে তুলবো না।

কথা— মোহিনী চৌধুরী

(৪)

কয়লাকুঠির কুলি- দম্পতির গান

কোইলামে হীরা মিলা

পুরুষঃ দেখি এক কোইলাওয়ালী য্যায়সি হ্যায়
কোয়েল কালী
গানা হ্যয় উন্‌কী বোলী, ঠাঁঠ, ঠ্যমকসে চমক খিলা।

স্ত্রীঃ ভুখ্ মে ভি জল্ যাওয়ে উনকা জীওয়ন
জানে ও ঝুঠা হয় প্রেমকা স্বপন্
তুম্‌নে যব্ সাম্‌নেসে আঁখ লড়ায়ী
উন্‌কা শির লাজ্‌মে হিলা।

পুরুষঃ ঠোক্‌ড়ী ছোড়ী ওতো নোকড়ী ছোড়ী
হয় কাঁহা গোয়ী মোরী ম্যন্‌কী গোরী
ঘর্ ঘর্‌মে উন্‌হে হম্ ঢূঢ়তে র‍্যহে
ফিরতে হে গাঁও গাঁও জিলা জিলা

সকলে কোইলামে হীরা মিলা।

স্ত্রী তুম্ চ্যহ্‌তে হো জিন্‌কো ম্যানানে
কোই উন্‌কা নাম না জানে
হীরা হো কোইলা হো ময়লা হো রং
দিল্ জানে প্রেম রঙীলা

সকলে কোইলামে হীরা মিলা
রামা হো।

কথা—মোহিনী চৌধুরী

আমি যা ই চলে যাই
ভুলে যেও যেও ভুলে
জেনো আমি নাই
কাঁটা সয়ে গেঁথেছি মালা
আলো জেলে পেয়েছি জালা
যে ব্যথা পেয়েছি আমি আমারি সে থাক
কারে জানাতে নাহি চাই।
আঁখি জল বলে মোর ওরে আলেয়া
মিছে হ'ল পথ চাওয়া তোর
পথিকে ভুলাতে এসে ভুলে গেলি পথ
কেঁদে কেঁদে হবে নিশি ভোর।
নীড় হারা ফিরেছে নীড়ে
হৃদয় গো চেওনা তুমি চেওনা ফিরে
মনে করো ভেঙ্গেছে স্বপন
হারানো মনের সাথী তাই
আমি যাই চলে যাই।

কথা— মোহিনী চৌধুরী

মহামায়া স্টোর্স
বুক সেলার্স
শ্রীরামপুর, হুগলী

নিউ সেঞ্চুরীর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল ও শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি. রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।